শ্রেষ্ঠ কিশোরগল্প

শ্রেষ্ঠ কিশোরগল্প

রহীম শাহ

তাম্রলিপি

শ্রেষ্ঠ কিশোরগল্প
রহীম শাহ

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৪

তাম্রলিপি : ৭৯৯

প্রকাশক
এ কে এম তারিকুল ইসলাম রনি
তাম্রলিপি
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

বর্ণবিন্যাস
তাম্রলিপি কম্পিউটার

মুদ্রণ
মা প্রিন্টিং প্রেস
১৮/২৩ গোপাল শাহ লেন, ঢাকা

মূল্য : ২৮০.০০

Srestho Kishoregolpo
By : Rahim Shah
First Published : February 2024 by A K M Tariqul Islam Roni
Tamralipi, 38/4 Banglabazar, Dhaka-1100

Price : 280.00 $10

ISBN : 978-984-98741-6-4

উৎসর্গ

পাঁচ কীর্তিমান কবিবন্ধু

ওমর কায়সার

বিশ্বজিৎ চৌধুরী

মিনার মনসুর

হাফিজ রশীদ খান

তারিক সুজাত

ভূমিকা

সানীবুড়ো শুধু গাধার সঙ্গে হাঁটেন তা-ও নয়, মাঝেমধ্যে সে নিজেও গাধার পিঠে চড়ে বসেন। সানীবুড়ো যেমন হাসিমুখে চাপেন আর চাপান, গাধাও মুখবুজে সবকিছু বহন করতে আর সহ্য করতে কখনও পিছপা হয় না। গাধারা যে কখনও বিরক্ত করে না সেটা আমাদের ভাগ্য। যা হোক, সানীবুড়ো তো গাধাকে নিয়ে রওনা দিলেন। কিন্তু গাধাটাকে স্টেশন পর্যন্ত হাঁটিয়ে আনতে তাকে যা বেগ পেতে হলো তা বলার মতো নয়। হতভাগা হাঁটতেই চায় না, যদি-বা হাঁটে, এক পা হাঁটতে প্রায় দুমিনিট লাগায়। রেলগাড়ি যে তার জন্য বসে থাকবে না সেই বুদ্ধিও যদি গাধার থাকে! শহর দেখার জন্য একটুও তার কৌতূহল আছে, চালচলন দেখে তা মনেই হয় না। সাধে কি আর তাকে সবাই গাধা বলে?

গাধারা একটু-আধটু বেখেয়ালি হয়! বিশ্বসংসারে এই নির্বিকার জীবটিকে টেনে কোনোরকমে তো তিনি স্টেশনে পৌঁছলেন। টানাপড়েনে দুজনেই ক্লান্ত তখন। কিন্তু গাধাটাকে কোন কামরায় তুলবেন? একথা জিগ্যেস করলেন স্টেশন মাস্টারের কাছে। ইস্টিশন মাস্টার জবাব দিলেন, 'কোথায় আর তুলবেন! গাধা কি আবার ফাস্টুকেলাসে যায় নাকি? গাধা যাবে পেছনের ভ্যানে। গাড়ির একদম পেছনে।'

এরপর শুরু হলো গল্পের আসল মজা। জানতে হলে পড়তে হবে এ বই। এ বইয়ের প্রতিটি গল্প পাঠককে শুধু হাসাবে না, বুদ্ধির খেলা বের করার মন্ত্র জোগাবে।

রহীম শাহ
২৭ জানুয়ারি ২০২৪
ঢাকা

সূচিপত্র

বুনো হাঁসের অভিযান	১১
জলাভূমির ছোট্ট কচ্ছপ	২২
পিংকির অভিযান	৩০
ওদের আসতে দাও	৩৯
মাশকান-শাপির সন্ধানে	৪৩
পড়ো, জানো আর তিন জানোয়ার	৫০
জিনানের জন্য ভালোবাসা	৬১
জাদুর বাঁশি	৬৯
আমাকে শান্তিতে থাকতে দাও	৭৭
রোদেলার জন্য ভালোবাসা	৯৫
নীল সাগরের কাঁকড়া	১০৩
স্বর্গীয় সোনারং পাখি	১১৯
রংধনু রং জাদুর ফুল	১২১

বুনো হাঁসের অভিযান

এখন হেমন্তকাল। শীত আসি আসি করছে। উত্তর দিক থেকে বুনো হাঁসের দল ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যাচ্ছে দক্ষিণে। ওদের নাম সুলঞ্চ। এসব বুনো হাঁস দেখতে খুবই সুন্দর। এদের মাথা ও ঘাড়ের রং পিঙ্গল। অন্যান্য হাঁসের তুলনায় শরীর লম্বাটে। সরু গলা। লেজের মাঝখান থেকে একটি চিকন পালক বেরিয়ে গেছে আলপিনের মতো। পিঙ্গল রঙের মাথার দুপাশ দিয়ে দুটি সাদা পটি সরু থেকে মোটা হয়ে বুক বেয়ে পেটে নেমে গেছে। ডানার পাশের পালকগুলো তামাটে সবুজ। ঠোঁট আর পা সিসে রঙের। এক কথায় অপূর্ব রূপসী পাখি সে। সূর্যের আলোতে তাদের পালকগুলো ঝিলমিল করে ওঠে।

ওরা এখন দূর দেশে পাড়ি দেবে। তার জন্য শুরু করল কঠিন প্রস্তুতি। শরীরে চর্বি জমাতে হবে। এ জন্য রংও পাল্টিয়ে নেয় তারা। যেন আসল রং ঢেকে নিয়েছে বোরখায়। পুরোনো ও জীর্ণ পালকগুলো উত্তর মহাসাগরে ফেলে দিয়ে তারা নতুন বেশ ধারণ করল। তাদের মেদবহুল শরীরে বলিষ্ঠভাব প্রকট হয়ে উঠল। এই সব প্রস্তুতি তাদের হাজার হাজার মাইল পাড়ি দেওয়ার ক্ষেত্রে কাজে আসবে।

নীল ও ঝকঝকে আকাশের পথে পাড়ি দেওয়ার সময় আগে আগে চলে একটি সাহসী ও বীর হাঁস। তার পেছনে অন্যান্য হাঁস। পথে কোনো বিপদ এলেই বীর হাঁসটি সঙ্গে সঙ্গে তার মোকাবেলা করে। অনেকটা পথ উড়ে যাবার পর তারা একটি নদীর চর বা নলখাগড়ার বন দেখে সেখানে নেমে পড়ে। কিছু সময়ের জন্য জিরিয়ে নেয়। ফাঁকে ফাঁকে ছোটোখাটো মাছ ধরে তাদের ক্ষুধা নিবারণ করে। যখন তারা নদীর চর বা জলাশয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে থাকে, তখন পুরো এলাকাটিকে অপূর্ব মায়াময় মনে হয়। এ যেন এক ফুলের বাগান। অবশ্য এই দৃশ্য বেশি সময় ধরে থাকে না। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ফুলের মতো সুলঞ্চরা ঝাঁকে ঝাঁকে হারিয়ে যায় মেঘের দেশে।

একদিন এক ঘটনা ঘটল। উড়তে উড়তে সন্ধ্যা হয়ে এলে রাত কাটাবার জন্য তারা একটি জলাভূমির পাশে এসে নেমে পড়ে। সারা জলাভূমিকে দখল করে রেখেছে নলখাগড়ার ঝোপ। বিশ্রাম নেওয়ার জন্য এমন জলাভূমিই তাদের প্রিয়। জলাভূমির কাছেই একটি গ্রাম। ছাড়া ছাড়া বাড়িও আছে এখানে কয়েকটি। সবই কাঁচা বাড়ি। এমন একটি বাড়ির উঠোনে কিছু পোষা হাঁস প্যাঁকপ্যাঁক করে ডাকছিল। চমকে উঠল সুলঞ্চরা। এসব ডাক তাদের জাতভাইয়ের না? কোথায় ডাকে এরা? কয়েকটি সুলঞ্চ উড়ে গিয়ে নামল সেই বাড়ির উঠোনে।

উঠোনটি ছিল বেশ বড়ো। সেখানে ছিল কয়েকটি বড়ো বড়ো গাছ এবং গৃহপালিত কিছু পশু। উঠোনের একপাশে খড়ের একটি গাদা। সেই খড়ের গাদার পেছনে গর্ত খুঁড়ে বাস করে একটি ধেড়ে ইঁদুর।

বুনো হাঁসেরা উঠোনে নামতেই চমকে উঠল পোষা হাঁসেরা। তারা প্যাঁকপ্যাঁক করে চিৎকার করে উঠল। যখন তারা দেখল বিপদের কোনো আশঙ্কা নেই, তখন আবার শান্ত হয়ে গেল।

এক সাহসী মোটাসোটা পোষা হাঁস মাথা দোলাতে দোলাতে আবছা আলোয় কিছুক্ষণ ওই বুনো হাঁসদের চেহারা দেখতে লাগল। বুকে বেশ সাহস নিয়ে বলল, 'বাহ্, তোমরা তো দেখতে একেবারে আমাদেরই মতো। তোমাদের বাড়ি কোথায়? মনে হয় তোমরা অনেক বেশি পরিশ্রম করো। তোমরা এত রাতে কোথা থেকে এসেছ? যাবেইবা কোথায়?'

বুনো হাঁসেরা উত্তরে বলল, 'আমাদের এখনও দু-এক হাজার মাইল পাড়ি দিতে হবে। আমরা অনেক দূরের সেই উত্তর মহাসাগর থেকে এসেছি।'

'উত্তর মহাসাগর আবার কোথায়? সেটি কি আমাদের এই জলাভূমির মতোই বড়ো?'

'ইস্, কী যে বলো না তুমি! তোমার কথা শুনলে যে কারও হাসি পাবে। উত্তর মহাসাগর তোমাদের জলাভূমি থেকে লক্ষ লক্ষ গুণ বড়ো। এপার-ওপার দেখা যায় না।'

কথাটা শুনে হাসি পেল যেন পোষা হাঁসের। পোষা হাঁসেরা তো সাগর দেখেনি! সাগরের আয়তন সম্পর্কে যে তার কোনো ধারণা নেই। বুনো হাঁসের কথা বিশ্বাস না হলেও সে খুব স্বাভাবিক থাকে। সন্দেহভরা কণ্ঠে বলে, 'তোমরা কি ওখানে খাবার হিসেবে নদীর শামুক, চিংড়ি এসব পাও?'

'ওখানে আছে অনেক ভালো-ভালো খাবার। আছে প্রচুর পরিমাণে মাছ। গ্রীষ্মকালেই এসব খাবার বেশি পাওয়া যায়। কিন্তু যখন ঠান্ডা পড়ে তখন এসব মাছের আকাল দেখা দেয়। পানি বরফে পরিণত হয়। খাবারের অভাব হয় আমাদের। তাই আমরা শীতকালটা কাটাবার জন্য দক্ষিণে ছুটে যাই। এভাবে আমরা প্রতি বছরই যাওয়া-আসা করি।'

'কী বলছ এসব!' পোষা হাঁস বিশ্বাসই করতে চায় না যেন, 'ইস্ কী কষ্ট তোমাদের! তোমাদের বউ-ছেলেমেয়েরাও কি এমন কষ্ট করে?'

তারপর মোটাসোটা সেই পোষা হাঁস মাথা দোলাতে লাগল। চুকচুক করতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে অন্য পোষা হাঁসেরাও আপসোস করতে লাগল। যেন তারা তাদের এসব জাত ভাইদের জন্য খুবই কষ্ট পাচ্ছে।

তাড়াতাড়ি বুনো হাঁসেরা পোষা হাঁসদের দিকে তাকিয়ে আশ্বস্ত করল, 'না-না, আমরা খুবই সুখে আছি। সবসময় পরিশ্রম করি আমরা। বলতে গেলে স্বাধীন ও আনন্দময় জীবন আমাদের। গ্রীষ্মকালে আমাদের দেশে আমরা ডিম পাড়ি। তা দিয়ে বাচ্চা ফুটাই। বাচ্চারাও খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে। কারণ ওখানে খাবার অনেক। শীতকাল এলে আমরা তাদের নিয়ে দক্ষিণের কোনো দেশে চলে যাই।'

এ কথা বলতে-বলতে আনমনা হয়ে যায় বীর সুলঞ্চ। তার চোখে ভেসে ওঠে সবুজ একটি দেশের ছবি। পাহাড়, সাগর, নদী, জলাশয় সবই আছে এখানে।

হঠাৎ ঘোর কাটে যেন তার। 'যে কোনো নদী বা জলাশয়ের তীরে আমরা দিন কাটিয়ে দিতে পারি। যেখানে থাকি সেখানেই খাবার খুঁজে নিই। দক্ষিণের দেশে তিন-চার মাস কাটিয়ে যখন আমরা আবার আমাদের দেশে ফিরে যাই, তখন বাচ্চারা বেশ স্বাস্থ্যবান ও জোয়ান হয়ে ওঠে। আমাদের এক জীবনে যে কত পাহাড়-পর্বত, নদী-ঝরনা পার হতে হয়। খেতে হয় ক্ষেত আর নদনদীর খাবার। এর কোনো সীমা-পরিসীমা নেই।'

সুলঞ্চ বলে চলল, 'আমরা আমাদের অভিযানকে আনন্দময় করে তুলি নানাভাবে। জন্ম থেকেই আমরা সংকল্পবদ্ধ। কোনো বাধাকেই আমরা ভয় পাই না। মৃত্যুভয় আমাদের নেই। এ কারণে জলের গভীর থেকে মেঘের দেশ পর্যন্ত আমাদের আয়ত্তে এসেছে। আমরা জলের গভীর থেকে মাছ শিকার করে খাই আর আনন্দ করার জন্য উড়ে যাই মেঘের দেশে। এর জন্য আমাদের অনেক বিপদের মুখোমুখি হতে হয়। কখনও কখনও শকুন বা

ঈগল এসে আমাদের মধ্য থেকে কাউকে-কাউকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। কেউ-কেউ পরিশ্রান্ত হয়ে নিচে পড়ে যায়। কখনও কখনও আমরা শকুন বা ঈগলের সঙ্গে লড়াই করি দল বেঁধে। দলবদ্ধ থাকি বলে বেশির ভাগ সময় আমরা জিতে যাই। উদ্ধার করে নিয়ে আসতে পারি বিপদে পড়া সঙ্গীদের। আবার নিচে পড়ে যাওয়া সঙ্গীদেরও আমরা সাহায্য করতে দলবদ্ধভাবে এগিয়ে যাই। তবুও প্রতি বছর আমরা দল বেঁধে উড়ে চলি। এতে আছে অনেক সুখ আর আনন্দ। কত স্বাধীন আমরা। আমরা যদি একই জলাভূমিতে সবসময় বাস করি তাহলে অনেকেই মনের দুঃখে অসুস্থ হয়ে পড়বে।'

এত সব কথা শুনে পোষা হাঁসেরা আরও উৎসাহের সঙ্গে মাথা নাড়তে লাগল। একটি পোষা মেয়ে-হাঁস অন্য একটি বুনো মেয়ে-হাঁসকে ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা নিজেরাই ডিমে তা দাও, সত্যি?'

'আমরা না দিলে ঈগল এসে তা দেবে? তোমার এ কথায় আমার খুব আশ্চর্য লাগছে।' বুনো মেয়ে-হাঁস একটু অসন্তোষের সুরে উত্তর দিল।

'কিন্তু ব্যাপারটি তো খুবই ঝামেলার।' অন্য পোষা মেয়ে-হাঁস সহানুভূতির সুরে বলল, 'আমাদের মা-বাবা, দাদা-দাদিদের কাছে শুনেছি, আমাদের পূর্বপুরুষেরা কয়েক হাজার বছর আগে নিজেরাই এ কাজটা করতেন। কিন্তু দিনবদলের সঙ্গে সঙ্গে তা দেওয়ার মতো এসব ঝামেলার কাজ আমরা ছেড়ে দিয়েছি। আমরা নদীর তীরে বা জলাশয়ে খেলা করতে করতে যেখানে খুশি সেখানে ডিম পাড়ি। কে তা দিচ্ছে না দিচ্ছে এসব আমাদের দেখার বিষয় নয়। এভাবে প্রতি বছর কত ডিম পাড়ি তার হিসাব আমরা রাখি না। আমরা জানি মানুষেরা আমাদের হয়ে তার যত্ন নেবে। মুরগিরাও আমাদের ডিমে তা দেয়। বাচ্চা ফোটার পর অবশ্য বাচ্চাদের দেখাশোনা আমরা করি। অল্প সময়ের মধ্যেই বাচ্চারা 'মা...মা' করে ডেকে-ডেকে আমাদের কাছে চলে আসে, আমাদের ঘিরে ধরে। আমাদের পক্ষে মা হওয়াটা এখন অনেক সহজ হয়ে গেছে। কিন্তু তোমরা এখনও অনেক কষ্ট করছ।'

একটি পোষা বাচ্চা-হাঁস দেখতে কমবয়সি একটি বুনো হাঁসকে জিজ্ঞাসা করল, 'জন্মাবার পরই কি তোমাদের এত দূর পথ পাড়ি দিতে হয়? এ কাজ তো খুব কঠিন।'

তরুণ বুনো হাঁসটি অবাক হয়ে পোষা বাচ্চা-হাঁসকে দেখতে লাগল। 'কঠিন হবে কেন? আমরা তো এসব অনেক দিন ধরে অভ্যাস করি। জন্ম

থেকে আমাদের ডানা এমন যে শুধু ডানাটা নাড়ালেই স্বাভাবিকভাবেই আমরা আকাশে উড়তে পারি। পৃথিবীর প্রতিটি পাখির ডানা আছে তো ওড়ার জন্যই।'

পোষা বাচ্চা-হাঁস বলল, কিন্তু আমাদের ডানা আমরা অত সহজে নাড়াই না। এত কষ্ট করার দরকার কী! কেবল আনন্দের সময় হলেই আমরা আমাদের ডানা নাড়াই। এই যেমন ধরো, কর্তা যখন খাবার নিয়ে আমাদের কাছে আসে, তখন আমরা ডানা নেড়ে ঝাঁপাঝাঁপি করে ছুটে আসি। মাঝেমধ্যে জলকেলি করার সময়ও আমরা ডানা নাড়ি। আমরা অবশ্য জানি যে ডানা হলো ওড়ার জন্য। তাই আমরা কখনও কখনও পাড় থেকে জলে নামার সময় উড়েই যাই। উড়তে-উড়তে পানিতে পড়ি। কিন্তু তোমাদের মতো অনেক উঁচুতে, মেঘের দেশে ওড়ার মতো শক্তি ও সাহস কোনোটাই আমাদের নেই।'

এসব কথা শুনে বুনো হাঁসের আফসোসের সীমা থাকে না। প্রায় করুণার সুরে বলল, 'হায়! এমন জীবন কোনো জীবনই নয়। এ কেমন জীবন তোমাদের!'

সাহসী পোষা হাঁস প্রতিবাদের সুরে বলল, আমাদের জীবন খুব সুখের। আমরা কেবল খাইদাই আর আনন্দ করি। সময় হলেই ঘুমাই। দেখো না, আমাদের স্বাস্থ্য কেমন গাট্টাগোট্টা! তেলতেলে! তোমরা বুনো হাঁসেরা এখনও সভ্য হওনি। আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন সম্পর্কে তোমাদের কোনো ধারণাই নেই। সারা বছর দূর-দূরান্তে ঘুরে বেড়িয়ে নিজেদের ক্লান্ত করে ফেলো। খোরাকির জন্য সমস্ত সময় ব্যয় করো। তাকিয়ে দ্যাখো, মানুষেরা আমাদের জন্য কী চমৎকার করে স্থায়ী ঘর বানিয়ে দিয়েছে। একটু সামনে গেলেই জলাশয়। থাকা-খাওয়ার কোনো চিন্তাই নেই আমাদের। আমরা জানি যারা আমাদের পোষেন তারা সময় মতো রান্না করা ভাত আর ধানের তুষ নিয়ে আসবেন। আমরা এও জানি, কোথায় গেলে শস্যের দানা, নদীর শামুক, ছোটো ছোটো মাছ পাব।'

সব কথা যেন মনোযোগ সহকারে শুনতে লাগল বুনো হাঁসের দল। পোষা হাঁসেরা বলে চলল, 'আমরা জানি আকাশে উড়তে গেলে ঈগলেরা আমাদের আক্রমণ করতে পারে। কাজেই আমরা আকাশে উড়তে যাব কোন্ দুঃখে? আমাদের জন্য যেটা ভালো আমরা সেটাই করব। আমরা জোর করে বলতে পারি এই জলাভূমির মতো বড়ো ও সুন্দর জলাভূমি পৃথিবীর বুকে আর

নেই। আমাদের বাবা, দাদা, দাদার বাবা সবাই এখানে বড়ো হয়েছেন। বংশ-পরম্পরা আমরা এই জলাভূমিকেই সবচেয়ে ভালো জায়গা বলে মনে করে আসছি। তোমরা যে বড়ো বড়ো নদীর কথা বলছ, পাহাড়-পর্বতের কথা বলছ তা কোথাও আছে বলে আমরা বিশ্বাসই করি না। আমাদের স্বাস্থ্য দেখলে বুঝা যায় আসলে কারা সুখী।'

পোষা হাঁসগুলো বেশ নাদুস-নুদুস। তাদের শরীর থেকে মেদ যেন ফেটে পড়ে। অনেক হাঁটতে হয় বলে তাদের পা-গুলোও মোটামুটি বড়ো। অনবরত নাড়াবার জন্য হতে পারে তাদের পেছনের অংশও বেশি বড়ো। অন্যদিকে বুনো হাঁসেরা অনবরত উড়ে বেড়ায় বলে তাদের ডানাগুলো খুবই মজবুত। তাছাড়া প্রায়ই নিজেদের শরীর দিয়ে ঝড়-বৃষ্টি আর তুষারের সঙ্গে লড়াই করতে হয় বলে তাদের পেটের মাংসপেশিও খুব শক্ত। এভাবে শুধু নিজেরা তুলনা করলে তো হবে না, মীমাংসার প্রয়োজন।

শেষে বুনো হাঁস আর পোষা হাঁস মিলে ঠিক করল তারা সালিশের কাছে যাবে। তখন পোষা হাঁসেরা বলল, 'এখন অনেক রাত হয়ে গেছে, সালিশ খুঁজতে বাইরে যাওয়া সহজ হবে না। আমাদের এই উঠোনেই থাকে কুকুর। তার খুব বুদ্ধি। পেট পুরে খায় আর শুয়ে শুয়ে ধ্যান করে। তাকে ধ্যান করতে হয় বলে বাড়িও পাহারা দেয় না। সারারাত ধ্যান করে। ভোর হলে ধ্যান ছাড়ে। খাবার খায়। সে খুব মোটা বলেই ভালোভাবেই জানে সুখ কী? যে কারও চেয়ে সে ভালো সালিশ করতে পারবে।'

পৃথিবীতে কুকুর নামে যে এক চিন্তাশীল জীব আছে এ কথা শুনে বুনো হাঁসেরা অবাক হয়ে গেল। কয়েক জনের চোখ কপালে উঠল নাকি মাথায় উঠল বোঝা গেল না। তাই তারা কুকুরের সঙ্গে দেখা করতে যেতে রাজি হলো। কর্তার বাড়ির বারান্দায় ধ্যানে থাকা কুকুরের ঘরে আসল সবাই। পোষা হাঁসেরা জাগিয়ে তুলল তাকে। তারপর তাদের আসার উদ্দেশ্য বলল।

কুকুর চোখ ডলতে-ডলতে হেঁড়ে গলায় বলল, 'এখন আমার ঘুমোবার সময়। এত কষ্ট করে তোমরা যখন আমার কাছে এসেছ, তাহলে বলি, সুখ মানে সময়মতো বেশি বেশি খাওয়া আর বিশ্রাম। সেদিক থেকে তুলনা করলে তোমাদের দুই দলের মধ্যে আমার পুরোনো প্রতিবেশী পোষা হাঁসেরাই সবচেয়ে সুখী। তাদের কখনও ভারী তুষারপাত, প্রচণ্ড বাতাস, ক্লান্তি আর শকুন-ঈগলের মুখোমুখি হতে হয় না। আমার মনে হয় এই যুক্তিটা বোঝা খুবই সহজ।' বলে মোটা কুকুর আবার ঝিমুতে লাগল।